SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

লোকনৃত্যে নারী : প্রসঙ্গ পুরুলিয়া জেলা

Biplab Kumar Mahato
Research Scholar
Sidho-Kanho-Birsha University
Purulia, West Bengal, India
Email: biplabmahato63@gmail.com

Abstract: সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও লোকনৃত্য সংস্কৃতির এই চারটি জনপ্রিয় অঙ্গের মধ্যে লোকনৃত্য পুরুলিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুচর্চিত সংস্কৃতি প্রকরণ।লোকনৃত্য আসলে একটি প্রাচীন শিল্পকলা। পুরুলিয়ার মানুষের অন্দরমহলে লোকনৃত্যের চর্চা। মানুষের হাঁটা-চলা,কথাবলা এমনকি সমাজ পরিবারের সঙ্গে লোকনৃত্যের আত্মিক যোগ।বহুবৈচিত্র্য ও বিচিত্ররূপ নিয়ে পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলি সমৃদ্ধ। ছৌ, ঝুমুর, জাওয়া, কাঠি, নাটুয়া, মাছানী প্রভৃতি নৃত্যগুলি এ জেলার মানুষ পরম্পরাগতভাবে পালন করে আসছে। স্বভাবতই রুখা মাটি আর শুখা ভূমির দেশ পুরুলিয়ার সর্বত্রই নাচের প্রকৃতি। লোকনৃত্য এখানকার মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, জেলার সুষ্ঠু সংস্কৃতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী। এ জেলার লোকনৃত্যগুলিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অবাধ ও স্বাধীন অনুপ্রবেশ দেখা যায়। বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানভিত্তিক নৃত্যগুলিতে নারীর ভূমিকায় অধিক। উল্লেখ্য পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত লোকনৃত্যগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যে তাৎপর্যপূর্ণ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

Keywords: লোকসংস্কৃতি, লোকজীবন, লোকনৃত্য, মুখোশনৃত্য, মাছানী, নৃত্যপটিয়সী।

সংস্কৃতির চারটি অঙ্গের মধ্যে নৃত্যকলা বা লোকনৃত্য অন্যতম। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার চেয়ে মূলত অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে নাচই সর্বশ্রেষ্ঠ। লোকনৃত্য হাল আমলের সৃষ্টি নয়, বলা যায় আদিমতম শিল্পকলাগুলির একটি লোকনৃত্য। নাচের সঙ্গে গানের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে তথাপি গান অপেক্ষা নাচ প্রাচীন, স্বভাবের দিক থেকে। মানুষ সৃষ্টির প্রাক্ মুহূর্ত থেকেই নাচ মানুষের জীবনযাপনের অংশ হয়েছে। আদিপর্বের নৃত্যকলার মধ্যে জাদু, সংস্কার, ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মানুষের জীবন বৈচিত্র্য, ও পরিবর্তিত জীবন বা জীবনের নানা পর্যায়ে উন্নিত হওয়ার ক্ষেত্রে নাচের বিরাট ভূমিকা আদিমকাল থেকেই। লোকনৃত্যগুলিতেও নারী ও পুরুষ সমবেত ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে। পল্লব সেনগুপ্ত লোকনৃত্যে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন— "নরনারীর যৌথনৃত্য অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে সবসময়ে কিংবা লোকনৃত্যের সর্বস্তরে প্রচলিত নয়। সাঁওতালি নাচের যে ধারাটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত, তারই সুবাদে এরকম একটা ধারণা অবশ্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এই ধরনের নাচগুলির মধ্যে নরনারীর একত্রে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে বিধি নিষেধ আছে। যেমন ছৌনৃত্য একান্তভাবেই পুরুষালি ব্যাপার, পক্ষান্তরে বৌ নাচের ধারে কাছে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের আসাই নিষেধ।"[১] মানব সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধাপ নৃত্য হওয়ায় নারীর উপস্থিতি সর্বজনীন। আদিম জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম বা ধর্মাচারণের মধ্যে নৃত্যের প্রকরণটির উদ্ভব হয়েছিল। লোকজীবন বা গোষ্ঠীজীবনের সমাজবদ্ধ মানুষ

সৃষ্টির প্রথম থেকেই প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে নেচে এসেছে। পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে যা মার্জিত রূপ নিয়েছে অনেকাংশে। প্রাচীন এই নাচগুলি আসলেই লোকনৃত্য। এগুলিতে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও সমানতালে অংশগ্রহণ করেছে। সেদিক থেকে লোকনৃত্যে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

পুরুলিয়ার মাটি লোকসংস্কৃতির মাটি। রুখা মাটি, শুখা ভূমির এই পুরুলিয়ার সর্বত্রই নাচের প্রকৃতি। লোকনৃত্যের পীঠস্থান। মূলত আদিবাসী সমৃদ্ধ এ জেলায় লোকনৃত্যের ভান্ডারও কম নয়, অফুরন্ত। উল্লেখ্য পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত লোকনৃত্যগুলির অধিকাংশই এখানকার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লোকনৃত্যগুলির মধ্যে যেমন জেলার মানুষের সমষ্টিগত পরিচয় আছে তেমনি উন্মুক্ত প্রকৃতির সহজাত রূপ প্রকাশিত হয়েছে এ নাচগুলিতে। উল্লেখ্য লোকনৃত্যের প্রধান গুণ হল শাস্ত্রীয় রীতিনীতিকে উপেক্ষা করা, যদিও ধর্মের কথা এগুলির গঠনশৈলীতে। পুরুলিয়া জেলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অজস্র লোকনৃত্যগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এখানের লোকনৃত্যগুলির গতি, ছন্দ ও কৌশল তথা প্রকৃতি বাস্তব জীবনের ব্যবহার ও আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লোকনৃত্যগুলির প্রধান অবলম্বন নৃত্যভেদে পোশাকের ভিন্নতা, সঙ্গে তাল, সুর আর প্রকাশের বিচিত্রিতা। পুরুলিয়া জেলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এই ধরনের লোকনৃত্যই অধিক চর্চিত যার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবনাচরণ। কিছু ধর্মীয় লোকনৃত্যে তো নারীরায় মূখ্য ভূমিকায়, পুরুষের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। আবার সামাজিক, সাংস্কৃতিক নৃত্যগুলিতেও নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলির মধ্যে ছৌ, করম, নাটুয়া, কাঠি, নাচনী, মাছানী, ঘেরা নাচ, বৌ, ধুমড়ি ঘোড়া, দাসাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ছৌ, করম, নাটুয়া, নাচে কৃষিসংক্রান্ত প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষনীয়। সমস্তনৃত্যেই নারীর ভূমিকা দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরায় নারী চরিত্রে নৃত্য করে থাকে। পুরুলিয়া লোকনৃত্য এখানকার মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, জেলার সুষ্ঠু সংস্কৃতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী। সাম্প্রতি অঞ্চলিকতার গন্ডী অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপি কদর পেয়েছে পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলি। সেদিক থেকে পুরুলিয়ার সব লোকনৃত্যগুলি পুরুলিয়ার ঐতিহ্য, ধারক ও বাহক। লোকনৃত্যগুলিতে নারীর উপস্থিতি, ভূমিকা, প্রবেশ ও পরিচিতি আলোচনা করা হল ----

ছৌ :

পুরুলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকনৃত্য হল 'ছৌ'। পুরুলিয়ার এই নাচ সমগ্র ভারত এমনকি সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ছৌ মূলত বীরত্বের নাচ। বীররস এ লোকনৃত্যের মূল তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। লোকনৃত্য ছৌ পুরুলিয়া ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলা বাকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, ভারতের কিছু রাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি জেলা ও রাজ্যগুলিতে দেখা যায়। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সর্বোৎকৃষ্ট হল পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য। এ নাচ এখানের মানুষের নিজস্ব কলা ও নিজস্ব সৃষ্টি। পৌরুষদৃপ্ত ভঙ্গিতে পুরুষদেরই অংশগ্রহণ দেখা যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও দেখা যাচ্ছে এ নাচে। গড়ে উঠেছে কয়েকটি মেয়েদের ছৌ দল। মহিলা ছৌ দলের আকর্ষণ বর্তমানে অনেক বেশি। রোমাঞ্চকর এই পুরুলিয়ার এই ছৌ নাচের জন্য দুজন শিল্পী পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। গম্ভীর সিং আর নেপাল মাহাত। ছৌ নাচের মূল আকর্ষণ নাচের তালে গানের প্রয়োগ। মূলত চৈত্র সংক্রান্তির সময় এই নাচের

শুরু হয়, চলে সারা বছর। নির্দিষ্ট কিছু দিন বন্ধ থাকে এই নাচ। জেলার কুর্মি, ভূমিজ, কুমার, সিং সর্দার, সহিস কোড়া প্রভৃতি জাতির মানুষের অবাধ অংশগ্রহণ দেখা যায়। তবে জেলায় মুসলমান সমাজেও এনাচ বেশ জনপ্রিয়। মুসলিম ছৌ শিল্পীও পুরুলিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকমত পাওয়া যায়। যেমন ড. সুভাষ রায় বলতে চেয়েছেন অতীতের বীরত্বব্যঞ্জক নাচ থেকে ছৌ নাচের উদ্ভব হতে পারে।

শ্রী রাজেশ্বর মিত্র বলেন— "সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে মুখোশনৃত্য লাসায় কেবলমাত্র লাসা সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় ছাম। এই ছাম শব্দটি ক্রমে ছাউ, ছৌ বা ছো তে পরিণত হওয়া আমাদের দেশে আশ্চর্য নয়।"[২] পুরুলিয়ার লোকগবেষক সুবোধ বসু রায় ছৌ নাচ বলতে 'ছাম' বা 'ছো' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন। এই নাচে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব কিন্তু অনার্য শ্রেণির লোকেরা এই নাচ করে থাকে। সেদিক থেকে সংস্কৃতির একটা মিশ্রণ দেখা যায়। ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত বলেন— "বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও লাফ-ঝাঁপ দেওয়াকেই বলে ছো করা"।[৩] লোক গবেষক সুধীর কুমার করণ বলেন— "যে অঞ্চলে ছৌ শব্দটি পাওয়া যায় তার নিজস্ব কোন অর্থ উক্ত অঞ্চলে অপ্রচলিত। কিন্তু সীমান্ত বাংলায় বাংলাভাষী সব জায়গাতেই ছো শব্দের ব্যবহার লোকসিদ্ধ।"[৪] ড. সুখেন বিশ্বাস জোকার নাচ থেকে ছৌ নাচের উদ্ভব বলে মনে করেন। যাই হোক পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলির মধ্যে জনপ্রিয় নৃত্য ছৌ।

ছৌ আসলে বীরত্বব্যঞ্জক বীররসের নাচ। পৌরুষদৃপ্ত পরাকাষ্ঠা এ নাচের মূলে। পুরুষেরায় নারী চরিত্রে এ নৃত্যে নেচে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে নারীরাও এ নাচে নিজেদের আগ্রহ দেখাচ্ছে,তৈরি হয়েছে জেলায় নারী কেন্দ্রিক কয়েকটি নাচের দল। তাদের অংশ গ্রহণে নাচ আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। তবে ছৌ নাচে ব্যবহৃত গানগুলির মধ্যেও একটা বীরভাব বর্তমান। ছৌ নাচে ব্যবহৃত অধিকাংশ গানই ঝুমুর বা ঝুমুর গানের সুর সম্পৃক্ত, তবে নাচকে আরও উৎকৃষ্ট ও রসসিক্ত করার জন্য আধুনিক গানের প্রয়োগও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হচ্ছে বা হয়ে চলেছে। ছৌ নাচের পালা প্রবর্তনের শুরুতেই 'গনেশ বন্দনা' দিয়েই নাচ শুরু করা হয়। এই গনেশ বন্দনার মধ্যে আবার দুর্গার ভূমিকাটি লক্ষনীয়। সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশকারী দেবী দুর্গা এ পালার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। সঙ্গে শিবের নাচও হয়ে থাকে। উল্লেখ্য দূর্গায় ভূমিকায় পুরুষেরায় তার মুখোশ পরে দুর্গা চরিত্রে নেচে থাকে। মাঝে মাঝে কয়েকজন সখীর প্রবেশ দেখা যায় ছৌ নৃত্যে। এই সখীরাও কিন্তু নারী নয়, পুরুষরায় নারী রূপ নিয়ে সখী চরিত্রে নৃত্য করেন। মূলত প্রাচীন রীতি মেনেই ছৌ নৃত্যে প্রথম দেবী বা দেবতার নৃত্য পরিবেশন করা হয়। গনেশ বন্দনার সেই পরিচিত বিখ্যাত ঝুমুর গান হল—

'সিন্দুর বরণ অঙ্গ মুষিক বাহন
সর্ব কাজে সিদ্ধিদাতা হরগৌরীর নন্দন
জয় জয় গজানন।'

দূর্গা আসরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুর গাওয়া হয়—

'কে বামা কেশরী পরে দশ করে অস্ত্র ধরে
নাচিছে ঘোর সমরে।।
রূপে যিনি চপলা

মহেশ প্রেম পাগলা।।
প্রফুল্ল পঙ্কজাননা ত্রিভঙ্গিনী ত্রিনয়না
মুক্তকেশি সুদর্শনা
ললাটে শশীকলা।।'[৫]

ছৌ নাচ অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য নাচ, প্রচুর সাধনার মাধ্যমে এ নাচের সফলতা। সে কারণেই এ নাচে নীরীর ভূমিকা ছিল না। কেন না ছৌ নাচের উপযোগী পরিশ্রম নারীর পক্ষে অসম্ভব। সে কারণেই তারা নিষিদ্ধ ছিল। অন্য একটি কারণও এখানে বলা যেতে পারে যে ছৌ নাচ আচরণ মূলক, অঙ্গ ভঙ্গি সম্পৃক্ত নাচ। আবার ধর্ম ও গ্রামদেবতার পূজার আচার উপলক্ষেই এ নৃত্যের অনুষ্ঠান। গ্রামদেবতার পূজা অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, পূজার প্রসাদ গ্রহণেও ছিল বাধা।সেদিক থেকে এ নৃত্যে নারীর অংশ যে নিষিদ্ধ হবে বলা যায়। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে, ধর্মাচারণের পদ্ধতিরও পরিবর্তন দেখা গেছে, ধীরে ধীরে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃষ্টি পেয়েছে। ছৌ নৃত্য তার ব্যতিক্রম হয়নি। উল্লেখ্য দুর্গা নাচে দেবীর সমস্ত প্রতিকৃতি তার রূপ ও শৌর্য এখানে প্রকাশিত কিন্তু এই দূর্গা চরিত্রে পুরুষই তার রূপ পরিগ্রহ করে। বিখ্যাত পুরুষশিল্পীর মধ্যে ধনঞ্জয় মাহাত, দুর্যোধন সূত্রধর, সনৎ মাহাত সূর্যকান্ত সহিস, নেপাল মাহাত, গম্ভীর সিং মুড়া প্রমুখ আরও প্রচুর ছৌ পুরুষ ছৌশিল্পী রয়েছে জেলায়। কিন্তু মহিলারাও সাম্প্রতিক সময়ের ছৌ নাচে পিছিয়ে নেই বললেই চলে। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।সেদিক থেকে এই লোকনৃত্য শিল্পকলায় মহিলাদের অবদান সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে পুরুলিয়ার কয়েকজন মহিলা ছৌ শিল্পী হলেন— মৌসুমি চৌধুরী, শ্যামলী চৌধুরী, গীতা মাহাত, চন্দনা মাহাত, সুমিতা মাহাত, প্রিয়াঙ্কা মাহাত প্রমুখ নারী ছৌ শিল্পীর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। গীতা মাহাত পুরুলিয়া নারী শিল্পীদের অন্যতম একজন, যিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছৌ নাচ পরিবেশন করেছেন এবং নারীকে এই আসার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। চন্দনা মাহাতও পুরুলিয়ার উদীয়মান নারী শিল্পী যিনি ছৌ নাচের প্রসার ও প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। আর প্রিয়াঙ্কা মাহাত, শ্যামলি চৌধুরী সৃজনশীল ছৌনৃত্যশৈলীর জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন এ জেলায়। সুতরাং সর্বস্তরে এই লোকনৃত্য শিল্পকলায় মহিলাদের অবদানও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সেই জন্য তো লোকগানের মাধুরী প্রাণ পেয়েছে লোকনৃত্য ছৌ এ—

"কারো দোষ দিও না নাম করি
পুরুষ নারী দুই জাদুকরী।"[৬]

ছৌ নাচের ক্ষেত্রে পালা অর্থাৎ পর্বগুলিই মূল। অধিকাংশ পর্বই আবার পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা বা চরিত্র কেন্দ্রিক। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক বাস্তব প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও ছৌ নৃত্যে পরিবেশিত হচ্ছে।যেমন কারগিল যুদ্ধ, বেটার বিহা, কন্যাশ্রী পালা, পনপ্রথা সম্পর্কিত পালা ইত্যাদি।

নাচনী নাচ :

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ একটি প্রচলিত আছে। পুরুলিয়া জেলা তার ব্যতিক্রম নয়।এখানেও সারা বছর সময়ান্তরে বিভিন্ন মেলা বা উৎসব লেগেই থাকে। আর এ-ই উৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্যানুষ্ঠানও হয়ে থাকে। পুরুলিয়ায় জনপ্রিয় নাচ ছৌ হলেও

নাচনী নাচও এখানের মানুষের মন জয় করে চলেছে অনেক আগে থেকেই। পুরুলিয়ার জনপ্রিয় নাচ গুলির একটি রসসিক্ত নাচ নাচনী। নাচনী শব্দটি মূলত নাচ শব্দ থেকেই এসেছে মনে করা হয়। এ নাচের প্রধান অবলম্বন নারী। নারীর স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ প্রবেশ দেখা যায় এই লোকনৃত্যে। লোকনৃত্যের প্রকরণটিও নারী কেন্দ্রিক, নারীকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় মঞ্চসজ্জা ও আড়ম্বর। বহু প্রাচীন এই লোকনৃত্যকলার নাচনী একান্তভাবেই স্ত্রী বাচক। মহাভারতে নারীর নৃত্যকলার প্রসঙ্গ রয়েছে, চিত্রাঙ্গদা বিশেষভাবে নৃত্যপটিয়সী রমণী ছিলেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাকে নৃত্যপটিয়সী, নাচনী হিসেবে তার দক্ষতা সর্বত্র প্রচারিত। লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলা নিছকই নাচনীর রূপ নিয়েছে। কাব্যে উল্লেখ আছে—

'বেহুলার বচনে শিব চাহে আড় আঁখি।
ঘনপাকে নাচে বেহুলা ময়ুরের পাখী'।[৭]

উল্লেখ্য বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছেন নাচনীর ভূমিকায় নিজেকে মেলে দিয়ে। এই নাচনী সমাজনিন্দিতা হয়েও সতীব্রতা রমণীর রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিতা। চর্যা পদেও নারীর নাচরে প্রসঙ্গ আছে। কবি কাহ্ন যখন বলেন—

'এক সো পদমা চৌসটঠী পাখুড়ী
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'[৮]

স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে প্রাচীন কালের ডোম জাতির মহিলারা নৃত্যপটিয়সী ছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যেও নাচনী প্রসঙ্গ আছে। জয়দেব রসিক আর পদ্মাবতী নাচনী—

'কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিদগতি।
রূপক তালব চেবে নাচে পদ্মাবতী।'[৯]

এছাড়াও আধুনিক সাহিত্যেও নাচনী নাচের বিষয়টি উঠে এসেছে। তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' উপন্যাসে নাচনী সমাজের কথা বলেছেন। তবে এই নাচনী কথা তাঁর উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির, নিম্নবর্গ ও নিম্নসম্প্রদায়ের। হয়তো বা পুরুলিয়া জেলায় তারাশঙ্করের নাচনী সম্প্রদায় অনুপস্থিত কিন্তু নাচনী এখানেও প্রচলিত সমাজকাঠামো থেকে যে খানিকটা পৃথক ছিল, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ সম্প্রদায়ের থেকে নাচনীরা উঠে এসেছে। এখানের নাচনীরাও বিভিন্ন জাতির। কামার, কুমার, হাঁড়ি ডোম মুচি, বাগদি, বাউরী, কোড়া, লোহার, ভূমিজ, লায়া, মাহালী, ভূইয়া প্রভৃতি নিম্ন সম্প্রদায় ভুক্ত। পড়াশোনা খুব একটা থাকে না। বলা যায় একেবারে নিরক্ষর। নাচনী নাচে থাকেন একজন রসিক, তিনিই আবার গুরু বা রক্ষক হন। রসিকই তার প্রেমাস্পদ। নাচনীর আচরণ মূলত রাধার মতো। উল্লেখ্য নাচনীদের পোশাক পরিচ্ছেদেও চমক দেখা যায়। পরনে ঘাঘরা, আঁটোসাঁটো ব্লাউজ, চুলে খোঁপা,কানে লম্বা দুল, হাতে কব্জি বিস্তৃত রঙিন চুড়ি, আঙুলে রুমাল, মুখে লিপস্টিক আর কপালে বড় টিপ সঙ্গে মুখে মাখে পাওডার আর পায়ে থাকে নূপুর। শোনা যায় এ পেশায় যুক্ত অধিকাংশ নাচনীরায় সমাজসংবিধানে নিন্দিতা এবং পরিত্যক্ত। এ পেশায় তারা বাধ্য হয়েই এসেছে, কেউ কেউ প্রেমের টানে। কিন্তু অধিকাংশই বাঁচার তাগিদে। আবার পারিবারিক দৈনদশা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও অনেক মেয়েকে এ পেশায় নিয়ে এসেছে। আবার কথিত আছে পূর্বে রাজা বা জমিদারও নাচ গান শেখা মেয়েদের রক্ষিতা হিসেবে রাখত পরে তারায় নাচনীতে পরিণত হয়েছে। নাচনী নাচে নাচনীর ভূমিকা সর্বাধিক হলেও রসিক

এক্ষেত্রে প্রথম নৃত্যশিল্পী। দ্বিতীয় নৃত্যশিল্পী নাচনী। পুরুলিয়া বিভিন্ন উৎসব পূজা অনুষ্ঠানে নাচনী নাচের ব্যাপক চল ছিল। বর্তমানে সে-ইধারা অনেকটা কমে এলেও কোথাও কোথাও এখনো কালীপূজা, দুর্গাপূজা, চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নাচনী নাচের আসর বসে। পূর্বে মানুষের পূজা অনুষ্ঠানে এ নাচ অপরিহার্য ছিল। এমনকি সামজিক অনুষ্ঠানগুলিতও নাচনী নাচের আয়োজন করা হত। নাচনী নাচের বিষয় কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, সঙ্গে দেহতত্ত্ব। তবে এক্ষেত্রে সামজিক সমস্যাও উপেক্ষিত হয়নি। অঙ্গ ভঙ্গি ও নাচের তালে ঈশারা এ নাচের প্রাণ, বা মূল আকর্ষণ। ঝুমুর গানের প্রয়োগই বেশি দেখা যায়। পুরুলিয়া বিশেষ পরিচিত ঝুমুর শিল্পীদের গানই এ নাচকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। কবি শিল্পী রামকৃষ্ণ, দীনা তাঁতি, বরজুরাম, প্রমুখ সকলেই একপ্রকার রসিক ছিলেন। এমনকি তাদের অনেকেরই নাচনী নাচের দলও ছিল। এছাড়া নাচনী নাচে ব্যবহৃত ছন্দ, তাল, লয় সবই ঝুমুর গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাচনী নাচে ব্যবহৃত ঝুমুর গুলিও নারীর প্রেম, অনুরাগ, পূর্বরাগের কথন—

ক) দূতী বলে ছি ছি শ্যাম তোমার এমন কাম,
করিঞে চাতুরী॥
পালাঞে রয়েছে মধুপুরী।
রসিক রস নাগর, ভাঙিব তোর ডিগর,
করিঞে চাতুরী।(বিনন্দীয়া সিং)

খ) সুবল কাঁদিয়ে বলে বিনাইয়ে
ও হরি নাগর হে কেনে হেন রীত।
কেনে অচেতন তুমি জগজীবন
ও হরি নাগর হে কাঁদে মোর চিত॥ (গৌরাঙ্গিয়া সিং)

পুরুলিয়ায় নাচনী নাচের ঝুমুর অজস্র লেখা হয়েছে বর্তমানেও অনেকে লিখছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত হলেন— সুনীল মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকার, চৈতু মাহাত, সলাবত মাহাত, প্রমুখ। বর্তমানেও এই নাচ পুরুলিয়ায় জনপ্রিয়। পূর্বে বা অতীতে নাচনী নাচকে কিছুটা হীন চোখে দেখা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই নাচনী নাচকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে শিল্পীর উপাধি লাভ করেছেন। আজও তাদের পুরুলিয়ায় খ্যাতি রয়েছে। জেলার কয়েকজন বিখ্যাত নাচনী শিল্পী হলেন— সিন্ধুবালা দেবী, পস্তবালা দেবী, জ্যোৎস্নাবালা দেবী, পার্বতীবালা দেবী, কমলা দেবী, বাসন্তী দেবী সুচিত্রা দেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কাঠি নাচ :

পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলির মধ্যে আর একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য হল কাঠি নাচ। মূলত পুরুষরায় নাচে এ কাঠি নাচ। কাঠি নাচ নারী অবয়বেই বেশি প্রচারিত। পুরুষরা নারীর রূপ নিয়ে কাঠি নাচ করে থাকেন। নারীর যে নেই এমনটা বলা যায় না কারণ নারীরা এ নৃত্য করেন মূলত অনুষ্ঠান ভিত্তিক। যুবক বা কিশোর ছেলেরা শাড়ি ব্লাউজ, পায়ে ঘুঘুর ইত্যাদি পরে গোল হয়ে পরস্পরের সঙ্গে গানের সুরে নৃত্য করে থাকে। কাঠি নাচের গানে আছে—

‘কাঠি নাচ করিতে সবে রে,
ভাইরে, ভাইরে, না করিও হেলা
সকল খেলার বড় খেলারে-

ওরে মোদের ভাই,
কাঠি নাচের নাচ'।[১০]

নাচিয়েরা এখানে অর্ধবৃত্তাকারে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নৃত্য পরিবেশন করে। হাতে দুটি কাঠি নিয়ে তারা নাচতে থাকে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে। নাচের মধ্যে একটা যুদ্ধের ভাব স্পষ্টভাবে ফোটে ওঠে। পুরুলিয়ায় করম উৎসব শেষ হলে কাঠি নাচের মহড়া শুরু হয়। অন্যদিকে দুর্গোৎসবের সময়, বিশেষকরে মহাষষ্ঠী দিন থেকে এই নাচ চলে বিজয়া দশমী পর্যন্ত। কথিত আছে দূর্গোৎসব পেরিয়ে গেলে এই নাচ আর করা যায় না। পুরুলিয়া ছাড়াও এই নাচ বাকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও কোনো কোনো জায়গায় এই নাচের প্রচলন আছে। আদিবাসীদের মধ্যে এই নাচের প্রচলন ছিল বেশি, সাম্প্রতিক সময়ে এই নাচে প্রায় সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য বর্তমানে জেলার চাকড়া গ্রামে এই নাচের দল রয়েছে। তারা জেলার বিভিন্ন জায়গায় এমনকি জেলার বাইরেও প্রয়োজন অনুসারে বা বুকিং অনুসারে এই নৃত্য করে থাকেন। পুরুলিয়ার বাগদি, ভূমিজ, কুড়মি, বাউরি প্রভৃতি নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষেরায় এ নাচে অংশ নেই। আট বা দশ জনের দল পরিচালনা করেন দলের বাদক ও গায়ক, তারাই আবার দলের পরিচালকও। কাঠি নাচ সৃষ্টির প্রকৃত ইতিহাস অজানা, তবে এ নাচ অনেক আগে থেকেই চলে আসছে বলে মনে করা হয়। কেউ আবার কাঠি নাচকে যুদ্ধ নৃত্যও বলতে চেয়েছেন। লোক গবেষক বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত মহাশয় কাঠি নাচ প্রসঙ্গে বলেছেন— "এই নৃত্য রাম রাবণের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাঠি নাচ রামের সৈন্যদের নৃত্য এবং সাঁওতালদের দশাঁয় বা ভুয়াঞ নাচ রাবণের সৈন্যদের নৃত্য। কিংবদন্তী অলীক কিংবদন্তী ছাড়া কিছু নয়। তবে এই সার নির্যাস। সৈন্যদের নৃত্য বা যুদ্ধনৃত্য যে এই কাঠি নাচ তা অস্বীকার করা যায় না"।[১১]

অন্যদিকে সুধীর কুমার করণ কাঠি সম্পর্কে বলছেন – "কাঠি নাচ যে মূলত: রাস নৃত্য সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই"।[১২] পূর্বে এই পুরুলিয়ার অনেক জায়গায় 'নাচকাঠি' নামেও বিশেষ পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই নাচের প্রসার খুব একটা দেখা যায় না। বলা যায় এই লোকনৃত্যটি প্রায় অনেকটা কমে গেছে। মানভূম লোকসংস্কৃতি উন্নয়ন সমিতি খানিকটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে কাঠি নাচ। এক্ষেত্রে শিল্পী বিমলেন্দু মাহাতর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাটুয়া নাচ :

পুরুলিয়ার জনপ্রিয় লোকনাচ গুলির একটি নাটুয়া নাচ। নট আর নাটুয়া এই দুটি শব্দের অর্থ প্রায় একই রকম। কিন্তু অবয়ব বা প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। নট বলতে নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায় নাটুয়া মানেও তাই। কিন্তু নটের ক্ষেত্রে অভিনয়ের জায়গা কম। কিন্তু নাটুয়া নাচে নাচের সঙ্গে অভিনয়ও গুরুত্বপূর্ণ। নাটুয়া সৃষ্টির দিক থেকে অনেক প্রাচীন। রামায়ণের সময়কেও নির্দেশ করে। কেন না মধ্যযুগে রচিত জগদ্রামী রামায়ণে নাটুয়া নাচের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে— 'নৃত্যগীত করে নাটুয়াতে যুথ মেলি' (জগদ্রামী রামায়ণ পৃষ্ঠা ৯২) উল্লেখ্য এই নাচকে কেউ নাটা নাচ বা লাটা নাচও বলতে চেয়েছেন। মূলত এটি কাহিনী বর্জিত, পুরুষদৃপ্ত নাচ। শিল্পীর শারীরিক সক্ষমতা, কসরৎ, বলবীর্যই অধিক প্রকাশিত। কাহিনী বর্জিত এ নাচে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ আছে কিন্তু মুখোশ নাই। বলা যায় পুরুলিয়া বিখ্যাত ছৌ নাচের মতোই এ নাচের প্রকরণ ও প্রকৃতি, বীরত্বব্যঞ্জক। ছৌ নাচের মতোই এ নাচ পুরুলিয়ায় বিদগ্ধজনের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত।

পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী মানুষের একক নৃত্যও বলা যায় নাটুয়া নাচকে। এ জেলার বাইরে খুব একটা বেশি নাটুয়া নাচ দেখা যায় না। নাচের বিশেষত্ব অর্থাৎ পৌরুষদৃপ্ত বলেই নারীর অনুপ্রবেশ নেই। কিন্তু নারীর রূপে, তার প্রকৃতি অবলম্বন করে এ নাচ শিল্পীরা নেচে থাকে। তবে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা বা অংশগ্রহণ না থাকলেও নারীর ভাবনার প্রকাশ রয়েছে। নাচের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ভারসাম্য রেখে ছন্দের সঙ্গে এগোনো আর পিছানো, লাফ দেওয়া, ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে খেলার মতো করে নৃত্য পরিবেশন করা। খালি গায়ে, মালকোঁচা ধুতি পরে, ফেট্টি বেঁধে ময়ূর পালক গোঁজে, হাতে ও পায়ে রঙিন ফিতা বেঁধে নাচিয়েরা নিজেদের সজ্জিত করেন।

নাটুয়া নাচ সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আদিবাসী সমাজের মধ্যে। উল্লেখ্য মঙ্গলকাব্যেও নাটুয়া সম্প্রদায়ের কথা আছে। এ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান পেশাও আসলে নৃত্য। সে দিক থেকে নাটুয়া নাচে নাটকের রস থাকলেও নারীর অনুপ্রবেশ নেই। যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পৃক্ত নৃত্যে আসলে মেয়েদের স্থান কম, নাটুয়া ব্যতিক্রম নয়, এ নাচেও সেই যুদ্ধ বিগ্রহের প্রকৃতি বর্তমান। বলা যায় মানভূম অঞ্চল বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সমাজের পুরুষদের সমৃদ্ধশালী নাচের একটি নাটুয়া নাচ। পুরুলিয়ার বাইরে কিছু কিছু জায়গায় এই নৃত্য অনেকসময় দেখা যায়। নাটুয়া নাচ প্রকৃতিগত দিক থেকে সমবেত নৃত্য। এ ক্ষেত্রে পুরুষরা দল বেঁধে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে নাচ করে থাকেন। আদিবাসী সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠান, এমন বিভিন্ন উৎসবের সময় এই নাচ অধিক মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই নাটুয়া শুরুটাও হয় শিবের গাঁজন উৎসবের সময়। দুই তিন মাস বেশ সাড়ম্বরে চলে এই নাটুয়া নাচ।এই নাচের শুরুতে বন্দনা অংশটুকুও দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যদিয়ে –

‘নমামি শঙ্করি তব নামে তরি
লীলা সব তোমারি
এ ছল বুঝিতে না পারি মা’।[১৩]

পূর্বে এ জেলায় নাটুয়া নাচ মানুষের কাছে বেশ আকর্ষণে কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। যদিও বর্তমানে বা সাম্প্রতিক সময়ে এ নাচ খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে সরকারি অনুকূল্যে কোথাও কোথাও এ নাচের প্রদর্শন দেখা যায়। উল্লেখ্য পূর্বে যে সমস্ত শিল্পী এই নাচ চর্চা করত আজ তাদের উত্তর প্রজন্ম এই নাচ চর্চা করেন না। বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীধর মাহাত, রাজীব মাহাত (বাঘড়াপখরা গ্রামের বাসিন্দা), গোবিন্দ সর্দার, মনভুল সর্দার (আড়তা গ্রাম), গুড়ুম গ্রামের নিবারণ কালিন্দী, ভিখু কালিন্দী, বড়গ্রামের মটর কালিন্দী, কাঁটাডির শ্রীপতি সহিস, নিতাই সহিস, কোনাপাড়ার খড়ু সহিস,গুণধর সহিস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নাটুয়া নাচের খানিকটা প্রচার ও প্রসার বেড়েছে। পুরুলিয়ার পাঁড়দা গ্রামের হাঁড়িরাম কালিন্দী কোনাপাড়া গ্রামের গুণধর সহিস প্রমুখ নাটুয়া শিল্পী এ নাচকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। এছাড়া সাঁতুড়ি থানার রামজীবনপুর গ্রামে নাটুয়া নাচের একটি দল রয়েছে। তিরিশ জনের শিল্পী দলটি তালবেড়্যা গ্রামে প্রতি বছর নৃত্য পরিবেশন করেন। নাটুয়া নৃত্যে নারীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ না থাকলেও নারীর ভূমিকা কম নয়। নারীরাও সাম্প্রতিক সময়ে এ নৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমর্থন জানিয়ে আসছে,বা এসেছে।

মাছানী নাচ :

পুরুলিয়ার জনপ্রিয় নাচ গুলির একটি মাছানী নাচ। পূর্বে এই নাচ পুরুলিয়ায় বেশ জনপ্রিয় ছিলো। বিনোদন বা অবসর সময়ের ক্ষেত্রে মাছানী নৃত্যের গুরুত্ব ছিল সমগ্র জেলা জুড়ে। জেলার প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই এই নাচের চল ছিল।মূলত ফাঁকা মাঠে বা গ্রামের রাস্তার মাঝে এই নাচ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতো,প্রায় সারাবছর ধরেই চলত এই নাচ। বর্তমানে এই নাচ খুব একটা দেখা যায় না। মাছানী আসলে নাটকের মতো করে পালা আকারে হতো, বলা যায় একধরনের নৃত্যনাট্য এই মাছানী। মাছানী নাচে গানের সঙ্গে সংলাপের প্রয়োগও দেখা যায়। গানগুলিও সমকালীন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষের মুখেই গাওয়া হত শুধুমাত্র মৌখিক আকারেই।এই নাচ কিভাবে শুরু হয়েছে তার সঠিক তথ্য আবিষ্কার করা না গেলেও মোটামুটি লোক গবেষকরা মনে করেন জেলে বা মাছ ধরা গোষ্ঠীর মধ্যথেকেই মাছানী নাচের সৃষ্টি। কথিত আছে পূর্বে জেলে মেয়েরা মাছ বিক্রি করতো ডালায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে,সঙ্গে গান বাঁধতো 'তোরা মাছ লিবি গো '।হয়তো বা এখান থেকেই কবিরা মাছানী নৃত্যের পালা লিখতে আরম্ভ করেন। অনেকেই মাছানী শব্দটি এখান থেকে এসেছে বলে মনে করে থাকেন। কেউ আবার কুড়মালি 'জড়িমাছা' শব্দ থেকে মাছানী শব্দটির উৎপত্তি বলে মনে করেন। এই জড়িমাছা হচ্ছে জড় অর্থাৎ দুই, দুজন ব্যক্তির অবয়বগত সাদৃশ্য।বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যারা মাছ ধরে অর্থাৎ মাছার তার স্ত্রীকে মাছানী বলতে চেয়েছেন। সঞ্জীব সরকার কুড়মালি জড়িমাছা শব্দটির উপর বেশি জোর দিয়েছেন— " The word machhani perhaps came from the kurmali word machha. The kurmali word ' Jorimachha' means resemblance of one person to another in hight, shape and age."[১৪] সুতরাং মাছ বিক্রয়ের বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

যাই হোক মাছনী লোকনৃত্য প্রাচীন নৃত্যনাট্য চর্চার আদর্শ চিহ্ন। উল্লেখ্য মাছানীর বিষয়, চরিত্র, কুশিলব এমনকি উপস্থাপনা সবই যেন অন্যান্য লোকনৃত্যগুলি থেকে আলাদা। তবে লোকসংস্কৃতির অন্যান্য প্রকরণের মতোই মাছানীর মূল বিষয় সমাজ ও তার নানা সঙ্গতি আর অসঙ্গতি। আসলে সমকালীন বাস্তব সমস্যায় যেন মাছানী নৃত্যের মূল অবলম্বন। কখনো সংলাপ, কখনো নাচের অঙ্গ ভঙ্গি বা কখনো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সমাজের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে থাকে। পালা আকারে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে মাছানী নৃত্য স্পষ্ট করে। এক্ষেত্রে পালাগুলির নামকরণও যেন হয় একটু অন্যরকম। যেমন— লদাই এর পিঠা খাওয়া, কানার সংসার, ডভা ঝিটা, খেপচা লেচা দুধুর পেঁচা ইত্যাদি পালা গুলি সামজের ব্যক্তি চরিত্র, আর সমাজিক অসংগতিগুলিকেই বেশি প্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রগুলি এ জেলার গ্রামীন মানুষ,অন্ত্যজ শ্রেণি শ্রমজীবী, মাহাত, ভূমিজ, সর্দার প্রভৃতি জাতির হয়ে থাকে। বলা যায় মাছানী নৃত্যের শিল্পীরা প্রত্যেকেই গ্রামের। তবে নাচের সঙ্গে গানের প্রয়োগ অবাধ। নাচের সঙ্গে গান আর মাঝে মাঝে সংলাপের প্রয়োগ এই লোকনৃত্যকে আরও আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করেছে। মাছানী নাচের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য, লোক জীবনের সঠিক রূপ, সমাজ মানুষের ক্রমবর্ধমান ধারা আর সেই সঙ্গে লোকমনের চিন্তাভাবনাও উপেক্ষিত হয়নি। লোকমুখে প্রচারিত মাছানী গানগুলি আজও পুরুলিয়া মানুষ ও সংস্কৃতির সম্পদ—

'জাকর ঘারে কানা বহু গো তাকর বেড়ি নাম

আঁধার ঘারে মিটিক পাড়ই আলক কেথিই কাম'।[১৫]

মাছানী পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকলেও নারীর উপস্থিতি খুবই সামান্য। শুধুমাত্র নারী চরিত্রে নৃত্য পরিবেশনের জন্য পুরুষরায় তার রূপ নিয়ে এ নাচ করে থাকে। তবে কথিত আছে পুরুলিয়া জেলায় সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক সময় নারীরাও এ নাচে অংশগ্রহণ করতো। তবে সেই ঐতিহ্য ও সত্যতা আজও অনাবিষ্কৃত। উল্লেখ্য মাছানী নামটিইও স্ত্রী লিঙ্গ, সেক্ষেত্রে নারী যে থাকবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি খুবই অল্প ছিল। পালা গুলির কিছু সংলাপে নারীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কথা আছে। 'লদাই এর পিঠা খাওয়া' পালায় ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, হদহইদা, আর নারী চরিত্র বহু উপস্থিতি দেখা যায়। এই বহু চরিত্রটির গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। তার উপস্থিতি নারীর মনোজগতকে যেমন স্পষ্ট করেছে তেমনি জেলার নারী বা মহিলার পরম্পরাগত স্বামীপ্রেম ও সংসারের বিষয়টিকেও প্রকাশ করেছে, একই সঙ্গে ফোটে উঠেছে নারী মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিও— 'ইটা হামার স্বামী বঠে গো'।

জাওয়া নাচ :

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন নৃত্যগুলির মধ্যে আর একটি জনপ্রিয় লোকনৃত্য হল জাওয়া বা করম নাচ। আদিম আদিবাসী নৃত্য হিসেবেই এ নাচ বেশি পরিচিত। এ নাচের প্রকৃতি বৃত্তাকারে গান গেয়ে নাচা। লোক গবেষক সৃষ্টিধর মাহাত এ নাচকে আদিম নৃত্যধারার অবশেষ বলে মনে করেন। জাওয়ার প্রধান অঙ্গ নাচ ও গান।লোকউৎসব জাওয়া গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি। এ নাচে নারীর অবাধ প্রবেশ। পুরুষের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। শ্রাবণ সংক্রান্তির শেষে ভাদ্র মাসের ১লা তারিখ থেকে এ উৎসবের সূচনা। কুমারী মেয়েরা সকালে স্নান সেরে নতুন ডালা বা টুপায় বালি ভরে তাতে বিভিন্ন শস্য ভুট্টা, কুথি, অড়হর, সরিষা, রমা, মুগ কলাই প্রভৃতি পুঁতে জাওয়া পেতে থাকে। যাকে জাওয়া ডালি বলে। অঙ্কুর বের হলে পরে সেগুলি নিয়ে মেয়েরা বৃত্তাকারে নাচতে থাকে, সঙ্গে তারা জাওয়া গীত ও করে। উল্লেখ্য জাওয়া গীতের তালে তালেই জাওয়া নাচের ঐতিহ্য। কুমারী মেয়েরায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে বলে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ছাপও স্পষ্ট হয় এ নাচে। বলা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্যের উৎসব, শস্য বৃদ্ধি ও মেয়ে সুখ সমৃদ্ধির উৎসব জাওয়া বা করম। উল্লেখ্য কুমারী মেয়েরা এ নাচে বা উৎসবে প্রজননের দেবতা করম দেবতার আরাধনা করে থাকে। বৃক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতির পূজা করা হয় এ উৎসবে। মেয়ের সামগ্রিক চেতানা, তার আশা আকাঙ্খা, কামনাও যুক্ত হয়ে এ নাচের প্রত্যকটি ভঙ্গিতে। কথিত আছে প্রকৃতির দেবতা করম তুষ্ট হলে বৃদ্ধি হবে চাষের, বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। করম স্থানীয় উৎসব। উৎসবকে কেন্দ্র করে নাচের সৃষ্টি। নাচে মায়ের প্রাধান্য, তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রবেশ। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই মেয়েরা এ নাচ করে থাকে। ভাদ্র মাসে এ নাচ হয় বলে ভাদরিয়া ঝুমুরও গাওয়া হয় অনেক সময়। যেকোনো নৃত্যের সঙ্গে গানের গভীর বা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জাওয়া নাচ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। মূলত যৌথ নৃত্য জাওয়া। মেয়েরা একে অপরের হাত হাত পায়ের সুনির্দিষ্ট ছন্দে শরীর দোলাতে দোলাতে এ নাচ করে থাকেন। এ নাচে নারীর জীবন বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে স্বাভাবিকভাবে। নাচ সম্পর্কিত গানগুলি যেন নারীর ভবিষ্যত জীবন, হতাশা, বিষন্নতা, উচ্ছ্বাস, আশা নিরাশার দলিল। বধূ জীবনের কথা ও ব্যথা একই সঙ্গে প্রকাশ পায় গানে। লোক গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা জাওয়া নাচের গান সম্পর্কে বলেছেন— "পিতৃগৃহ থেকে

স্বজনহীন স্বামীগৃহের দূরদেশে যাওয়া বিষন্নতা এদের চোখে মুখে মাখা। অধিকাংশ গানেই আছে বধূজীবনের কথা ও ব্যথা"।[১৬] জাওয়া আসলে ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় নারীর প্রেম প্রসঙ্গ অল্প। তবে ঘর গৃহস্থালি, পারিবারিক আশা আকাঙ্খার কথা জাওয়া গানের মূল অবলম্বন। নারীর নিজস্ব গান ও নাচ জাওয়া। নাচের প্রধান অধিকারিনীও নারী। এ নাচের গানে কুড়মালি বা লোকভাষায় অধিক প্রচলিত। যায় হোক জাওয়া নাচ পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজের নারীর জীবনযুদ্ধের নাচ। কুমারী মেয়ের আগামী শ্বশুর বাড়ির জীবন সংগ্রামও বিশেষভাবে স্পষ্ট। নাচের তালে যখন বলে—

'কাল্লা লত্ কাল্লা লত্
আগে মূলে জালি
শ্বশুর ঘরে বড়ই তিতালি'।[১৭]

নারীর জীবনবৈচিত্র্যের কথা জাওয়া নাচ ও গানের পরতে পরতে প্রকাশ পায়।

টুসু নাচ :

পুরুলিয়ার লোকউৎসবগুলির মধ্যে টুসু উৎসব বেশ জনপ্রিয়। উৎসবকে কেন্দ্র করেই মহিলারা নাচ করেন। উল্লেখ্য টুসু উৎসবে টুসু গীতের ঐতিহ্য পরম্পরাগত হলেও গানের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা নাচও করে থাকেন। এ উৎসবে মহিলাদের অবাধ প্রবেশ। তারা মূলত গান গেয়ে গেয়ে নাচ করে থাকেন। টুসু আসলে কৃষির দেবী, তাই নারীর আত্ম উন্মোচনের প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে উপেক্ষিত নয়। গান গুলির বিষয়ও নারীর জীবন বৈচিত্র্যের দলিল। প্রেম টুসু নাচে উপেক্ষিত নয়, নাচের মধ্যে যেন নারীর অস্পষ্ট মনের আকাঙ্খা ধ্বনিত হয়। পৌষসংক্রান্তির দিন, টুসু বিসর্জনের সময় এ নাচের গুরুত্ব বেশি, বিসর্জনের দুঃখ যেন নারীর অন্তরকে কাঁদায়।সেই সূত্রেই বিসর্জনের ঘাটেই চলে নারীর বিষাদঘন নৃত্য। স্বাভাবিকভাবেই নারীর চলমান জীবনের নানা চিত্র ধরা পড়ে, প্রকাশ পায় নারীর উদাসঘন বাস্তব ছবি। সম্মিলনের আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হয় বিষাদময়তায়। নারীরা মাথায় টুসু নিয়ে সকলে একত্রে নাচ করে, সঙ্গে চলে জল ছোঁড়া ছোঁড়ি। নারীর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিগুলি সহজেই প্রকাশ পায় এ নাচে। নাচের নির্দিষ্ট কোনো ছন্দ না থাকলেও পরিশীলিত অঙ্গ সমূহের উচ্ছ্বাস বর্তমান। সঙ্গে গানের রীতিও সমানভাবে চলে আসছে—

'আয় টুসু মা আয় মোদের ঘরে।
ঘরে থাক গো আলো করে'।।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এ জেলায় কোথাও কোথাও টুসু নাচে প্রতিযোগিতার আসরও বসে। উল্লেখ্য টুসু নাচের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়ে থাকে। যাইহোক পুরুলিয়ার জনপ্রিয় লোকনৃত্যগুলির মধ্যে টুসু নৃত্য অস্বীকার করা যায় না।

দাঁসাই নাচ :

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাচ হল দাঁসাই নাচ। এ নাচ জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব। দুর্গাপূজার পূর্বে প্রায় এক মাস ব্যাপি চলে এই নাচের আসর। নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ থাকে নাচে। পুরুলিয়া জেলার প্রায় অধিকাংশ গ্রামে যেখানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন সেখানে সাড়ম্বরে এই নাচ হয়ে থাকে। নারীরা বিশেষ সজ্জায় সেজে নাচ করেন। সাঁওতাল পুরুষেরা নাচের তালে বাজনা বাজান। কুড়মালি রহিন পরবের সঙ্গে এ নাচের একটা অদৃশ্য সম্পর্ক রয়েছে। নাচে বাদ্যযন্ত্র বলতে নাগড়া,ঢোল ধামসা ইত্যাদি। মেয়েরা পায়ে ঘুঁঘুর বেঁধে, মাঁথায় ময়ূর পালক

লাগিয়ে, পরনে লাল পাড় সাদা বা সবুজ শাড়ি পরে একে অপরের হাত ধরাধরি হয়ে নাচতে থাকে। নাচের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট চাল দেখা যায়, প্রত্যেকে সুসামঞ্জস্যভাবে বাজানার তালে পায়ের ছন্দ মিলিয়ে নাচ করে। পুরুলিয়ার বাইরেও কিছু জেলায় এ নাচ দেখতে পাওয়া যায়। লোকনৃত্যের অবক্ষয়ের সময়েও এই নাচ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আসলে দাসাই নাচের মধ্যে আদিবাসী যুবক যুবতীরা অনাদি কালের ইতিহাসকে আমাদের সমানে উন্মোচিত করে। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ নাচের চল দেখা যাচ্ছে। সাঁওতাল নারীরা স্বাধীনচেতা, রমনীর ব্যক্তিগত জীবনচেতনাও যেন অনেকখানি স্পষ্ট হয় দাসাই গানে ও নাচে। পুরুষরা মূলত এখানে ওস্তাদ আর মেয়েরা নৃত্যশিল্পী, তবে পুরুষেরাও নাচে থাকেন। সাঁওতালি গানের সুরে সাঁওতালি লোকনাচ দাসাই। এ নাচে আদিবাসী সমাজের দারিদ্রতা যেমন প্রকাশ পায় তেমনি নারীর প্রেম, আশা আকাঙ্খাও যেন সমান্তরালে ব্যক্ত হয়। প্রচলিত সমাজ প্রেক্ষিতে নারীর উচ্ছ্বাসঘন জীবনের আলেখ্যও ধরা থাকে নাচের অন্তঃকরণে। বর্তমানে এ নাচের চর্চা কম নয়, সাম্প্রতিক সময়ের এ জেলার মূল আকর্ষণও বলা যায় এ নাচকে। সরকারিভাবে এ নাচের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে শিল্পীর আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। গানের মধ্যেই যেন একটা নাচের সুর ধ্বনিত হয়— "জমা বন জুঁয়াবন রাস্কারেবন তাহেনা/থড়ে সিঞ মড়ে ইদা সহরায় দবন দাড়ান গেয়ারে"। (পান খেয়ে আনন্দে থাকবো, পাঁচ দিন পাঁচ রাত কাজ ভুলে আনন্দ উৎসবে থাকবো।) সাঁওতাল রমনীর জীবনপ্রকৃতির পরিচায়নে এ নাচের গুরুত্ব সাঁওতাল সম্প্রদায় ও জেলাবাসীর কাছে অনন্য।

ঘোড়া নাচ :

পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলির মধ্যে ঘোড়া নাচ একটা সময় মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলো। এ জেলায় এসময় গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঘোড়া প্রচলিত ছিল। কয়েকটি গ্রাম এই নাচের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। চেলিয়ামা, বড়রা সগড়কা, তুলসিবাড়ি উল্লেখযোগ্য। গুড়পার সীতারাম মাহাত ঘোড়া নাচের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ নাচ খুব একটা দেখা যায় না। পুরুলিয়া জেলার বাইরেও কিছু জেলা এ নাচ সাড়ম্বরে নাচা হতো। বাকুড়া, ঝাড়খন্ডের কিছু জেলায় এ নাচের ব্যাপক প্রচলন ছিল। হয়তো বিনোদনই ছিল এ নাচের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য অতীত ইতিহাস সুস্পষ্ট না হলেও পোষাক পরিচ্ছেদ দেখে মনে করা হয় এ নাচ রাজাদের আমলের। ঘোড়া নাচে ঘোড়া চরিত্রে পুরুষরা নাচলেও সঙ্গে পুরুষরায় নারীর রূপনিয়ে সখী চরিত্রে নাচত। ঘোড়া একক নৃত্য নয়, তার সঙ্গে সখী সমাবেশ নাচকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। তবে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে নাচনীদের অনুপ্রবেশ নাচকে আরও সমৃদ্ধি যুগিয়েছে। মূলত দুজন ঘোড়ার সঙ্গে দুজন নাচনীর উপস্থিতি থাকে এই নাচে। পাতলা বাঁশের তৈরি আদল দিয়ে ঘোড়ার অনুরূপ ফ্রেম তৈরি করে করে তাতে ঘোড়ার মুখোশ লাগিয়ে ঝুমুর গানের তালে সুর তুলে নাচ নাচা হয়ে থাকে। সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙিন পোষাক, হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘোড়া আসরে নামে সঙ্গে তার নাচনী। ঘোড়া নাচে ব্যবহৃত সংগীত আসলে ঝুমুর। প্রেম সম্পৃক্ত রসের ঝুমুরের আধিক্য দেখা যায় এ নাচের ক্ষেত্রে। ভাদুরীয়া ঝুমটা, খেমটা জুমুরের প্রয়োগই বেশি দেখা যায় ঘোড়া নাচে। বিবাহ অনুষ্ঠানে এই নাচের চল ছিল বেশি বর্তমানে বিকল্প পার্টি তৈরি হওয়ায় এ নাচ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ জেলার বাউরি, বাগদি, রাজোয়াড়, মাহাত, মালাকার ঘাসি সমাজের মানুষেরায় এ নাচ করতো। ঘোড়া এ ধরনের

উদ্যাম নৃত্য। মূল নাচে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকলেও পুরুষরা নারীর রূপ নিয়ে নাচনীর ভূমিকায় নাচ করত। এ নাচে ব্যবহৃত গান গুলির মধ্যে নারীর জীবন বৈচিত্র্য, সংসার জীবন, তার আকাঙ্খা, ও প্রণয়ের কথা প্রকাশ পায় সুললিত ভাবে। ঘোড়া আসলে তার প্রাণপুরুষ নাচনী তার প্রেয়সী। স্বাভাবিক পরিবারিক জীবনের অসঙ্গতিও ধরা পড়ে ঘোড়া নাচের রূপকে। ঘোড়ানাচের ঝুমুর এরকম—

'ডবল ডবল পানের খিলি ইসপেসাল চা খায়
সায়ার উপর শাড়ি লিব যেমন সায়াটি দেখায়'।[১৮]

এ নাচে গানের সুরে নারী নাচনীর সঙ্গে রসিকতা করা হয়, যা বাস্তব সমাজজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এ নাচের ঝুমুর গানে পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও উপেক্ষিত হয়নি যার দ্বারা নারীর দৈনন্দিন সংসারের কথা ভাষা পায়—

'মাইয়ের কুটুম আল্যে পরে বউয়ের পেট দুখায়
বউয়ের কুটুম আল্যে পরে রাইতে মাছ ধরায়'।[১৯]

যাইহোক পুরুলিয়া জেলার একটি বিশিষ্ট লোক আঙ্গিক এই ঘোড়া নাচ।

ঝুমুর নাচ :

পুরুলিয়াকে বলা হয় ঝুমুরের দেশ। ঝুমুর এখানকার মানুষের জীবনের চলার পথ আর পাথেয়। জেলার অধিকাংশ মানুষেরই এই নাচ ও গানের প্রতি টান চিরন্তন। লোকনৃত্য হিসেবে ঝুমুর নাচের জনপ্রিয়তা আজও আকাশছোঁয়া। উৎসব অনুষ্ঠানে আজও ঝুমুর নাচের আসর বসে। পুরুষেরায় নারীর রূপ নিয়ে এই ঝুমুর নাচ করে থাকে। নাচের গানগুলিও বাস্তবজীবন থেকে উঠে আসে। মেলা ও সামজিক অনুষ্ঠানেও এ জেলায় অনেক জায়গায় ঝুমুর নাচ হয়। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন জায়গায় নাচের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ নাচকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য নারীর অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে । আবহমান কালথেকে এ ঝুমুর নাচ জেলায় চলে আসছে, কৃষিজীবি মানুষের বিনোদনের মধ্যেমও এই ঝুমুর নাচ।

উল্লিখিত লোকনৃত্যগুলি ছাড়াও পুরুলিয়া জেলায় আরও কিছু লোকনৃত্য রয়েছে যেগুলি পূর্বে বেশ জনপ্রিয় ছিল। উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্যগুলি হল— ঘেরা নাচ, বৌ নাচ, ধুমড়ি নাচ, সখী নাচ, সাঁওতালি নৃত্য সহরায় প্রভৃতি। ঘেরা নাচ সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা দেখা যায় না। প্রকৃতি থেকেই এ নাচের উদ্ভব। ঘেরা নাচ এধরণের ফসল ভিত্তিক নাচ। এ নাচে প্রকৃতি মা ও মানব সমাজের কাছে মানবী। আদিবাসী জনজাতির মধ্যে এ নাচের চল অত্যধিক। এ নৃত্যে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে নৃত্য করে। মেয়েরা প্রত্যকে নিজেদের হাত ধরাধরি করে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য পরিবেশন করে। এক্ষেত্রে ছেলেরা বাজনা বাজায় আর নাচে মেয়েরা। নাচে মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের কথা উঠে আসে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহের প্রস্তুতির ছবিও প্রকাশ পায়। বৌ নাচ নিতান্তই মহিলাদের নাচ। বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়ই মূলত এই নাচ দেখা যায়। বৌ নাচ আসলে বৌকে অবলম্বন করে নাচ। বিয়ে বাড়ি আসা অতিথি মামী, মাসী, পিসিমা সবাই এ নাচে অংশগ্রহণ করে। এই নাচের মুখ্য উদ্দেশ্য নববধূ নাচ গানের মাধ্যমে আপন করে নেওয়া। পূর্বে এ নাচের বেশ গুরুত্ব ছিল সন্দেহ নেই। সখী নাচ মানভূমের একটি বিশিষ্ট লোকনৃত্য কলা। এ নাচ মানভূমের লোক উদ্ভুত একান্তভাবেই স্বতন্ত্র স্বাদের নাচ। সখী নাচে পুরুষ মানুষ স্ত্রীর বেশ ধরে নৃত্য পরিবেশন করে। জেলার ছৌ নাচে সখী নাচের প্রকরণ দেখা

যায়। চটুল প্রকৃতির নাচ এই সখী নাচ। জেলার শশী কালিন্দী চেপরার, পৈতু দাস ভালুভাষার এই নাচের জন্য বিশেষভাবে চর্চিত। এছাড়া অন্যান্য লোকনৃত্যগুলিতে নারীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। সাঁওতালি নৃত্যগুলির অধিকাংশই তো নারী কেন্দ্রিক মহিলা নৃত্য। নাচের ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা অবিচ্ছিন্ন অংশীদারিত্ব রয়েছে। পুরুলিয়ার লোকনৃত্যগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

Endnotes

১) সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ২১৩
২) রায়, সুবোধ বসু সম্পাদিত, 'ছত্রাক', ৯ ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২১২
৩) মাহাত, ড. পশুপতি প্রসাদ, 'জঙ্গলমহল- রাঢ়ভূম ও ঝাড়িখন্ডের ভূমিব্যবস্থা', প্রিয় শিল্প প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ৯১
৪) করণ, ড. সুধীর কুমার, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭১,এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলকাতা ১২, পৃষ্ঠা ২২১
৫) রায়, ড.সুভাষ, 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', টেরাকোটা বিষ্ণুপুর, বাকুড়া ২০০৫, পৃষ্ঠা ২১০
৬) গোস্বামী, দিলীপ কুমার, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', ব্রজভূমি প্রকাশনী, পুরুলিয়া, পৃষ্ঠা ১৫৮
৭) ভট্টাচার্য,শ্রী বসন্ত কুমার, সংকলন, 'পদ্মাপুরাণ', সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৩২
৮) দাশ, ড. নির্মল, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩,শ্রাবণ ১৪১৯ অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৭
৯) মুখোপাধ্যায়,শ্রী হরেকৃষ্ণ, সংকলন, 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০৩/১/১,কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮
১০) গোস্বামী,দিলীপ কুমার, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', ব্রজভূমি প্রকাশনী,তৃতীয় প্রকাশ ২০২০,পৃষ্ঠা ১৭৩
১১) মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য', প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ৭৫
১২) করণ, ড. সুধীর কুমার, 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৭১,এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলকাতা ১২, পৃষ্ঠা ২৫৯
১৩) গোস্বামী,দিলীপ কুমার, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', ব্রজভূমি প্রকাশনী,তৃতীয় প্রকাশ ২০২০,পৃষ্ঠা ১৭৫
১৪) রায়, ড.সুভাষ, 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', টেরাকোটা বিষ্ণুপুর ,বাকুড়া ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৭১
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৩
১৬) সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ, 'ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান', মুক্তধারা ৭৪, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, পৃষ্ঠা ১৮
১৭) গোস্বামী, দিলীপ কুমার, 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি', ব্রজভূমি প্রকাশনী,তৃতীয় প্রকাশ ২০২০,পৃষ্ঠা ৬৮
১৮) রায়, ড.সুভাষ, 'পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি', টেরাকোটা বিষ্ণুপুর, বাকুড়া ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯৭
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৭

Bibliography

- চট্টোপাধ্যায়, ড.তুষার, "লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা", দেজ পাবলিশিং,কলকাতা - ৭৩,সেপ্টেম্বর ২০১৫
- আহমেদ, ওয়াকিল, "লোককলা প্রবন্ধাবলি",দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট ২০০৫,গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা
- সরকার, পবিত্র, "লোকভাষা লোকসংস্কৃতি", তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৩, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
- সেনগুপ্ত, পল্লব "লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ", দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০২,পুস্তক বিপনি,কলকাতা ৭০০০০৯
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ, "বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি", প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৩,দে বুক স্টোর, কলকাতা ১২
- ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ, "বাংলা লোকসাহিত্য", দ্বিতীয় খন্ড: ছড়া,ক্যালকাটা বুক হাউস ১৩৬৯
- চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, "লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান",দেজ পাবলিশং, কলকাতা৭৩, নভেম্বর ২০১৫
- বিশ্বাস, ড.সুজিত কুমার, "রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি", আনন্দ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৫,কলকাতা ৭০০০০৭
- মাহাত, ক্ষীরোদ চন্দ্র, "মানভূম সংস্কৃতি", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,প্রথম প্রকাশ ২০১৬
- সেন, শ্রমিক, মাহাত, কিরীটি সম্পাদিত, "লোকভূমি মানভূম", বর্ণালী প্রকাশনী, কলকাতা ৯

——